সূরা আল-হিজর:২য় রুকুঃ আয়াত সংখ্যাঃ(১৬-২৫)

Sisters'Foruminislam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ لَقَدۡ جَعَلۡنَا فِی السَّمَآءِ بُرُوۡجًا وَّ زَیَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِیۡنَ ১৫ : ১৬

১৬. আর অবশ্যই আমরা আকাশে বুরুজসমূহ সৃষ্টি করেছি এবং দর্শকদের জন্য সেগুলোকে সুশোভিত করেছি.

وَ حَفِظۡنٰهَا مِنۡ کُلِّ شَیۡطٰنٍ رَّجِیۡمٍ ১৫ : ১৭

১৭. এবং প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে আমরা সেগুলোকে সুরক্ষিত করেছি;

اِلَّا مَنِ اسۡتَرَقَ السَّمۡعَ فَاَتۡبَعَهٗ شِهَابٌ مُّبِیۡنٌ ১৫ : ১৮

১৮. কিন্তু কেউ চুরি করে শুনতে চাইলে প্রদীপ্ত শিখা তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

بروج শব্দটি برج এর বহুবচন। এটি বৃহৎ প্রাসাদ, দুর্গ ও মজবুত ইমারত ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ, কাতাদাহ, প্রমুখ তাফসীরবিদগণ এখানে بروج এর তাফসীরে বৃহৎ নক্ষত্র উল্লেখ করেছেন। [তাবারী]

আর এর থেকেই تبرج শব্দের উৎপত্তি; যার অর্থ মহিলাদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা। এখানে আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রকে بروج বলা হয়েছে, কারণ সেগুলি বড় উঁচুতে প্রকাশমান। কেউ কেউ বলেন, بروج বলতে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহের কক্ষপথসমূহকে বুঝানো হয়েছে যা তাদের জন্য নির্দিষ্ট।

সে হিসেবে আয়াতের অর্থ, আকাশে বৃহৎ নক্ষত্র সৃষ্টি করেছি। সাধারণত: সূর্যের পরিভ্রমণ পথকে যে বারটি স্তরে বিভক্ত করা হয়ে থাকে, বুরুজ শব্দটি দ্বারা এখানে তা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে বলে কোন কোন মুফাসসির মনে করেছেন। হাসান বসরী ও কাতাদা এটিকে গ্রহ-নক্ষত্র অর্থে গ্রহণ করেছেন। [ফাতহুল কাদীর]

অন্য এক স্থানে আকাশকে তারকারাজির সাহায্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার কথা বলেছেন। যেমনঃ

إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ

"আমি কাছের আকাশকে নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা সুশোভিত করেছি, [সূরা আস-সাফফাতঃ ৬]

وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَـٰبِيحَ وَجَعَلْنَـٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَـٰطِينِ ۖ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ

আর অবশ্যই আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং সেগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছি জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি। আল-মুলকঃ ৫

অত:পর তিনি সেগুলোকে সাত আসমানে পরিণত করলেন দু' দিনে এবং প্রত্যেক আসমানে তার নির্দেশ ওহী করে পাঠালেন এবং আমরা নিকটবর্তী আসমানকে সুশোভিত করলাম প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম সুরক্ষিত। এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের ব্যবস্থাপনা। হা-মীম আস-সাজদা (ফুসসিলাত);১২

এখানে নক্ষত্র সৃষ্টির দু'টি উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথমতঃ আসমানের সৌন্দর্যবর্ধন। কেননা, তা প্রদীপের মত দীপ্তিমান সুন্দর দেখা যায়।

দ্বিতীয়তঃ শয়তানদল যখন আসমানের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন একে উল্কারূপে তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয়।

এর তৃতীয় উদ্দেশ্য যেটাকে অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে তা হল, তার দ্বারা সমুদ্রে ও স্থলে পথ ও দিক নির্ণয় করা হয়।

رجيم শব্দটি مرجوم এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে। رجم (রজম) এর অর্থ পাথর ছুঁড়ে মারা। শয়তানকে 'রাজীম' এই জন্য বলা হয় যে, সে যখন আকাশের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন তাকে আকাশ থেকে জ্বলন্ত শিখা (উল্কা) ছুঁড়ে মারা হয়। রাজীম অভিশপ্ত ও বিতাড়িত অর্থেও ব্যবহার হয়। কারণ যাকে পাথর ছুঁড়ে মারা হয় তাকে চতুর্দিক থেকে অভিসম্পাত করা হয়। এখানে মহান আল্লাহ এ কথাই বলেছেন যে, আমি আকাশকে প্রত্যেক অভিশপ্ত শয়তান হতে রক্ষা করে থাকি ঐ সকল গ্রহ-নক্ষত্র দ্বারা, যা আঘাত হেনে শয়তানকে পালাতে বাধ্য করে।

যেসব শয়তান তাদের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষকদেরকে গায়েবের খবর এনে দেবার চেষ্টা করে থাকে, যাদের সাহায্যে অনেক জ্যোতিষী, গণক ও ফকির বেশধারী বহুরূপী অদৃশ্য জ্ঞানের ভড়ং দেখিয়ে থাকে, গায়েবের খবর জানার কোন একটি উপায়-উপকরণও আসলে তাদের আয়ত্বে নেই। তারা চুরি-চামারি করে কিছু শুনে নেবার চেষ্টা অবশ্যি করে থাকে।

হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "মাঝে মাঝে ফিরিশতারা আকাশের নীচে মেঘমালার স্তর পর্যন্ত অবতরণ করত এবং আসমানের সংবাদাদী নিয়ে পরস্পর আলোচনা করত। শয়তানরা শূন্যে আত্মগোপন করে এসব সংবাদ শুনত এবং গণকদের কাছে তা গোপনে পৌছিয়ে দিত। গণকরা এগুলোর সাথে শত মিথ্যা নিজেদের পক্ষ থেকে জুড়ে দিয়ে তা বলে বেড়ায়।" [বুখারীঃ ৩২১০, ২২২৮] পরে উল্কাপাতের মাধ্যমে তা বন্ধ করে দেয়া হয়।

অন্য এক হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ যখন আসমানে কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন তখন ফেরেশতাগণ তার নির্দেশের আনুগত্য স্বরূপ তাদের ডানাগুলোকে মারতে থাকে তাতে পাথরের উপর জিঞ্জির পড়ার মত শব্দ অনুভূত হয়। তারপর যখন তাদের অন্তর থেকে ভয়ভীতি দূর হয় তখন তারা বলতে থাকেঃ তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তারাই আবার বলেঃ হক্ক বলেছেন, তিনি বড়, মহান। কান লাগিয়ে কথাচোরগণ এ কথোপকথন শুনতে পায়।

আর এসব কান লাগিয়ে শ্রবণকারীগণ একটির উপর একটি থাকে। বর্ণনাকারী সুফিয়ান তার হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তার ডান হাতের আঙ্গুলগুলোকে ফাঁক করলেন এবং একটির উপর আর একটি

স্থাপন করলেন। তারপর কখনো কখনো উজ্জল আলোর শিখা সে কান লাগিয়ে শ্রবণকারীকে তার সাথীর কাছে কথা পৌছানোর পূর্বেই আঘাতে করে জালিয়ে দেয়। আবার কখনো কখনো আলোর শিখা তার কাছে পৌঁছার আগেই সে তার নীচের সাথীকে তা পোঁছিয়ে দেয়। এভাবে পৌছাতে পৌছাতে যমীন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তারপর যাদুকর বা গণকের মুখে রেখে দেয়। তখন সে যাদুকর তথা গণক সে সংবাদের সাথে শতটি মিথ্যা মিশ্রিত করে বর্ণনা করে। আর এভাবেই তার কোন কোন কথা সত্যে পরিণত হয়। তারপর লোকেরা বলতে থাকেঃ সে কি আমাদেরকে বলেনি যে, অমুক অমুক দিন এই সেই হবে, তারপর আমরা কি সঠিক পাইনি? আসলে সেটা ছিল ঐ বাক্য যা আসমান থেকে শোনা গিয়েছিল। [বুখারীঃ ৪৭০১]

شهاب এর আভিধানিক অর্থ উজ্জ্বল আগুনের শিখা। এখানে বলা হয়েছে, (شِهَابٌ مُبِينٌ) কুরআনের অন্য জায়গায় এজন্য (شِهَابٌ ثَاقِبٌ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। [সূরা আস-সাফফাতঃ ১০]

আবার কোথায়ও বলা হয়েছে, (شِهَابًا رَصَدًا) [সূরা আলজিনঃ ৯]

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের এক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যে আকাশে তারকা খসে পড়ল। তিনি সাহাবীদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ জাহেলিয়াত যুগে অর্থাৎ ইসলাম-পূর্বকালে তোমরা তারকা খসে যাওয়াকে কি মনে করতে? তারা বললেনঃ আমরা মনে করতাম যে, বিশ্বে কোন ধরণের অঘটন ঘটবে অথবা কোন মহান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ কিংবা জন্মগ্রহণ করবেন। তিনি বললেনঃ এটা অর্থহীন ধারণা। কারো জন্ম-মৃত্যুর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব জ্বলন্ত অঙ্গার শয়তানদেরকে বিতাড়নের জন্য নিক্ষেপ করা হয়। [মুসলিমঃ ২২২৯]

প্রশ্ন: গণক ও জ্যোতিষীরা কি গায়েবের খবর রাখে? এবং গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার বিধান কী ?

উত্তর: না, গণক ও জ্যোতিষীরা গায়েবের খবর রাখে না। আল্লাহ তাআলার কথাই এর দলীল। যেমন তিনি বলেন,

قُلْ لاَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ

অর্থ:‘(হে রাসূল! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আপনি বলে দিন, একমাত্র মহান আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনে আর যারা থাকে তাদের কেহই গায়েবের খবর রাখে না, এমনকি তারা এটাও জানে না যে কবে তাদেরকে কবর থেকে উঠানো হবে। সূরা নামল: ৬৫

* গণক ও জ্যোতিষীদের কথা বিশ্বাস করার বিধান হলো, তা আল্লাহর সাথে কুফুরী করা। যেমন এ প্রসঙ্গে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“مَنْ أَتَى عَرَّافاً،أَوْكَاهِناً، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ” .صحيح -رواه أحمد)

অর্থ: ‘যে ব্যক্তি গণক অথবা জ্যোতিষীদের নিকট গেল, অত:পর তারা যা বলল তা বিশ্বাস করল, তাহলে সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যে ‘কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে তার সাথে কুফুরী করল। (অর্থাৎ সে আল্লাহর সাথেই কুফুরী করল) (সহীহ, আহমাদ)

এই উম্মাতের মধ্যে এ বিষয়ে যা সর্বাধিক বেশী সংঘটিত হয়, তা হচ্ছে জিনেরা তাদের মানব বন্ধুদেরকে হারানো বস্তুর সন্ধান দেয় এবং যমীনে যেসব ঘটনা ঘটে তার সংবাদ এনে দেয়। মূর্খরা এটিকেই কাশফ ও কারামত মনে করে। অনেক মানুষ এর মাধ্যমে ধোঁকায় পড়েছে। যারা জিনদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে খবর দেয়, মূর্খরা তাদেরকে আল্লাহর অলী মনে করে। অথচ তারা হচ্ছে শয়তানের বন্ধু। আল্লাহ তাআলা বলেনঃ

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

'যেদিন আল্লাহ্‌ সবাইকে একত্রিত করবেন, সেদিন তিনি জিনদের সম্বোধন করে বলবেনঃ হে জিন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছো। তাদের মানব বন্ধুরা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের কতক কতিপয়কে খুব ব্যবহার করেছে।তুমি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলে, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্‌ বলবেনঃ আগুন হলো তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; তা থেকে রক্ষা পাবে একমাত্র তারাই যাদেরকে আল্লাহ রক্ষা করতে চাইবেন। নিশ্চয়ই তোমার রব প্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী' ' । (সূরা আনআমঃ ১২৮)

সহীহ মুসলিম শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কতিপয় স্ত্রী থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ

«مَنْ أَتَى عَرَّافاً فسأله عن شيئ فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً»

'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল, তারপর তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করল, অতঃপর গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হবেনা। সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ গণকের কাজ নিষিদ্ধ এবং গণকের কাছে যাওয়াও নিষিদ্ধ।

**** ইহূদীগণের মধ্যে যাদুর প্রচলন ছিল। তারা আরো দাবি করত যে, সুলাইমান (আঃ) যাদু ব্যবহার করেই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। তারা আরো দাবি করত যে, স্বয়ং সুলাইমান (আঃ) এবং হারূত ও মারূত নামক দুই ফিরিশতা তাদেরকে যাদু শিক্ষা দিয়েছেন। এদের এ মিথ্যাচারের প্রতিবাদে কুরআন কারীমে সূরা বাকারার ১০২ আয়াতে এরশাদ করা হয়েছে:

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ

' 'এবং সুলাইমানের রাজত্বে শয়তানগণ যা আবৃত্তি করত তারা (ইহূদীরা) তা অনুসরণ করত। সুলামইমান কুফুরী করেননি কিন্তু শয়তানরাই কুফুরী করেছিল। তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। এবং যা বাবিলে হারূত ও মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপর অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা কাউকে শিক্ষা দিত না, এ কথা না বলা পর্যন্ত যে, 'আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, সুতরাং তোমরা কুফুরী করিও না।...''

এ আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যায় সাহাবী ও তাবিয়ীগণের যুগ থেকেই মুফাসসিরগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু আববাস (রা) ও অন্য কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন যে, হারূত ও মারূতের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত

আরবী (ما) অর্থ (না)। অর্থাৎ হারূত মারূত ফিরিশতাদ্বয়ের উপরেও যাদু অবতীর্ণ করা হয় নি। সুলাইমানের (আঃ) সম্পর্কে ইহূদীদের দাবি যেমন মিথ্যা, হারূত ও মারূত সম্পর্কেও তাদের দাবি মিথ্যা।
তবে অধিকাংশ মুফাস্সির বলেছেন যে, ইহূদীগণ যখন কারামত-মুজিযা ও যাদুর মধ্যে পার্থক্য না করে সবকিছুকেই যাদু বলে দাবি করতে থাকে তখন আল্লাহ দু’ জন ফিরিশতাকে দায়িত্ব প্রদান করেন যাদুর প্রকৃতি এবং যাদু ও মুজিযার মধ্যে পার্থক্য শিক্ষা দানের জন্য। তারা মানুষদেরকে এ পার্থক্য শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, তোমরা এই জ্ঞানকে যাদুর জন্য ব্যবহার করে কুফুরী করবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকেই যাদু ব্যবহারের কুফুরীতে নিমগ্ন হতো।

কোনো কোনো মুফাস্সির বলেছেন, তাঁরা দুইজন মানুষ ছিলেন; বিশেষ জ্ঞান, পান্ডিত্য বা সৎকর্মশীলতার কারণে তাদেরকে মানুষ ফিরিশতা বলে অভিহিত করতো। তাঁরা এভাবে মানুষদেরকে যাদুর অপকারিতা শিক্ষা দিতেন।

وَ الۡاَرۡضَ مَدَدۡنٰهَا وَ اَلۡقَیۡنَا فِیۡهَا رَوَاسِیَ وَ اَنۡۢبَتۡنَا فِیۡهَا مِنۡ کُلِّ شَیۡءٍ مَّوۡزُوۡنٍ ১৯ : ১৫

১৯. আর যমীন, এটাকে আমরা বিস্তৃত করেছি, তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি; এবং আমরা তাতে প্রত্যেক বস্তু উদগত করেছি সুপরিমিতভাবে,

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টিজগতের এক পরম সত্য ও সুক্ষ্ম ভারসাম্যের কথা তুলে ধরেছেন। পৃথিবীতে গাছপালা, খাদ্যসামগ্রী, খনিজ সম্পদ এবং প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান একটি নির্দিষ্ট পরিমাপ ও নিখুঁত ভারসাম্য (Ecological Balance) বজায় রেখে সৃষ্টি করা হয়েছে, যা মানবজাতি ও অন্যান্য জীবজগতের বেঁচে থাকার জন্য একদম উপযোগী।

এর দুটি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ

এক অর্থ, প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে উৎপন্ন করেছি। এ সব উৎপন্ন বস্তুকে আল্লাহ্ তা'আলা একটি বিশেষ সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন।

إِنَّا كُلَّ شَىۡءٍ خَلَقۡنَـٰهُ بِقَدَرٍ ৪৯ : ৫৪

নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। সূরা কামারঃ৪৯

সূরা আল-ফুরকান (আয়াত ২): "...তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথ অনুপাতে।

"সূরা আর-রহমান (আয়াত ৭-৯): "তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন ভারসাম্য। যাতে তোমরা ভারসাম্য লংঘন না করো। তোমরা ন্যায্য ওজন কায়েম করো এবং ওজনে কম দিও না।

"সূরা আল-মূলক (আয়াত ৩): "যিনি সাত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না। আবার তাকিয়ে দেখ, কোনো ফাটল দেখতে পাও কি?"

দুই, যমীনে তিনি এমন জিনিস তৈরী করেছেন যা ওজন করা যায় এবং পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। [ইবন কাসীর] মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

আর তিনিই যমীনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ়পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং সব রকমের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন, নিশ্চয় এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।সূরা রাদঃ ৩

ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টিগোচর হয়। [ফাতহুল কাদীর] কুরআনুল কারীম সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সম্বোধন করে। বাহ্যদর্শী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্য এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। সব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্ট জীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পর্বত-শৃঙ্গে বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্য কোন চৌবাচ্চা নেই এবং তা তৈরি করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত হওয়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এ ফল্গুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কুপের মাধ্যমে এ ফল্গুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

কুরআনে বর্ণিত প্রকৃতির ভারসাম্যের আয়াতগুলোর সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের পরিবেশগত ভারসাম্য (Ecological Balance) এবং মহাজাগতিক শৃঙ্খলার দারুণ মিল রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করছেন যে, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রকৃতির প্রতিটি উপাদান কতটা নিখুঁত অনুপাতে সাজানো।

নিচে এর প্রধান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাগুলো দেওয়া হলো:

১. বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের নিখুঁত অনুপাত (সূরা আল-ক্বামার: ৪৯)

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব টিকে আছে বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের এক অলৌকিক ভারসাম্যের কারণে।

নাইট্রোজেন (৭৮%): এই পরিমাণ কম হলে উদ্ভিদ পুষ্টি পেত না, আবার বেশি হলে আগুন নেভানো অসম্ভব হতো।

অক্সিজেন (২১%): অক্সিজেনের পরিমাণ ২৫% হলে পৃথিবীতে অনবরত দাবানল জ্বলত। আবার ১৫% এর কম হলে মানুষ ও প্রাণী শ্বাসরোধ হয়ে মারা যেত।

কার্বন ডাই অক্সাইড (০.০৪%): এটি উদ্ভিদকে খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে এবং গ্রিনহাউস ইফেক্টের মাধ্যমে পৃথিবীর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। এর সামান্য তারতম্য পুরো পৃথিবীকে বরফ অথবা ফুটন্ত চুল্লিতে পরিণত করতে পারে।

২. ওজোন স্তর ও মহাজাগতিক ভারসাম্য (সূরা আর-রহমান: ৭)

"আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন ভারসাম্য"—বিজ্ঞানের পরিভাষায় এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরকে নির্দেশ করে, যা আমাদের রক্ষা করছে।

ওজোন স্তর (Ozone Layer): সুর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি (UV rays) শোষণ করে পৃথিবীর জীবজগৎকে রক্ষা করে।

গ্র্যাভিটি বা মহাকর্ষ: পৃথিবী এবং সুর্যের মধ্যকার দূরত্ব এবং মহাকর্ষীয় ভারসাম্য এতটাই নিখুঁত যে, পৃথিবী যদি সুর্যের সামান্য কাছে যেত তবে সব পুড়ে ছাই হয়ে যেত, আর দূরে গেলে সবকিছু জমে বরফ হয়ে যেত।

৩. বাস্তুতন্ত্র বা ফুড চেইন (সূরা হিজর: ১৯)

প্রকৃতিতে প্রতিটি জীব ও উদ্ভিদের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে নিয়ন্ত্রিত।

খাদ্য শৃঙ্খল (Food Chain): একটি বনে হরিণের সংখ্যা বাড়লে ঘাস শেষ হয়ে যাবে, আবার বাঘের সংখ্যা বাড়লে হরিণ বিলুপ্ত হবে। প্রকৃতিতে শিকার ও শিকারির এই অনুপাত আল্লাহ "সুপরিমিতভাবে" নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কীটপতঙ্গ ও পরাগায়ন: মৌমাছি ও অন্যান্য কীটপতঙ্গ যদি ফুল থেকে পরাগায়ন না করত, তবে পৃথিবীর ৭০% উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যেত।

৪. পানির চক্র বা হাইড্রোলজিক্যাল সাইকেল (সূরা আল-ফুরকান:

২)পৃথিবীতে পানির মোট পরিমাণ সবসময় নির্দিষ্ট এবং অপরিবর্তিত থাকে। সমুদ্রের পানি বাষ্প হয়ে আকাশে যায়, মেঘ হয় এবং বৃষ্টি হিসেবে আবার মাটিতে ফিরে আসে। এই চক্রের সামান্য বিচ্যুতি ঘটলে কোথাও চিরস্থায়ী খরা, আবার কোথাও মহাপ্রলয়ংকারী বন্যা দেখা দিত।

وَ جَعَلۡنَا لَکُمۡ فِیۡهَا مَعَایِشَ وَ مَنۡ لَّسۡتُمۡ لَهٗ بِرٰزِقِیۡنَ ২০ : ১৫

২০. আর আমরা তাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য এবং তোমরা যাদের রিযিকদাতা নও তাদের জন্যও।

معايش শব্দটি معيشة এর বহুবচন, অর্থ তোমাদের জন্য পৃথিবীতে জীবিকার অসংখ্য পথ ও উপায় সৃষ্টি করেছি।

অর্থাৎ, দাস-দাসী চাকর-ভৃত্য ও জীবজন্তু। অর্থাৎ, পশুকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছি, যাকে তোমরা বাহনরূপে ব্যবহার কর, যার উপর মালপত্র বহন কর এবং কিছুকে তোমরা ভক্ষণও কর। দাস-দাসী থেকে তোমরা তোমাদের কাজ নিয়ে থাক। যদিও এরা তোমাদের অধীনস্থ, তোমরা তাদের খাবারের ব্যবস্থা করে থাক, কিন্তু তাদের আসল জীবিকা নির্বাহকারী আমিই। তোমরা এটা মনে করো না যে, তোমরাই তাদের রুযীদাতা, তোমরা তাদেরকে খেতে না দিলে তারা মারা যাবে।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, মাতৃগর্ভে সন্তান থাকা অবস্থায় আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান এবং চারটি বিষয় লিখে দেওয়ার নির্দেশ দেন:"...ফেরেশতাকে তার রিযিক, তার আয়ুষ্কাল, তার কর্ম এবং সে কি সৌভাগ্যবান নাকি দুর্ভাগ্যবান—এই বিষয়গুলো লিখে দেওয়ার জন্য আদেশ করা হয়।" (সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

* "আর পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর নেই। তিনি তাদের স্থায়ী ও অস্থায়ী বাসস্থান সম্পর্কেও সম্যক অবগত।" সূরা হুদ: ৬

"নিশ্চয়ই আল্লাহই একমাত্র রিযিকদাতা, তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, মহা শক্তিধর।" সূরা আয-যারিয়াতঃ৫৮

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করো। আল্লাহ ছাড়া কি এমন কোনো স্রষ্টা আছে, যে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবী থেকে রিযিক দান করে? তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।" সূরা ফাতিরঃ ০৩

হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:"তোমরা যদি আল্লাহর ওপর সঠিক ও যথাযথভাবে ভরসা (তাওয়াক্কুল) করতে, তবে তিনি তোমাদের ঠিক সেভাবেই রিযিক দান করতেন যেভাবে পাখিদের দান করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসা থেকে বের হয় এবং সন্ধ্যায় তৃপ্ত হয়ে বাসায় ফেরে।" (সূনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৪৪)

"হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং রিযিক অন্বেষণে উত্তম পন্থা অবলম্বন করো। কারণ, কোনো প্রাণীই তার জন্য নির্ধারিত রিযিক পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করার আগে কখনই মৃত্যুবরণ করবে না—যদিও তা পেতে কিছুটা বিলম্ব হোক না কেন। অতএব, আল্লাহকে ভয় করো এবং সুন্দরভাবে রিযিক তালাশ করো; যা হালাল তা গ্রহণ করো আর যা হারাম তা বর্জন করো।" (সূনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২১৪৪)

وَ اِنۡ مِّنۡ شَیۡءٍ اِلَّا عِنۡدَنَا خَزَآئِنُهٗ ۫ وَ مَا نُنَزِّلُهٗۤ اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعۡلُوۡمٍ ২১ : ১৫

২১. আর আমাদের কাছেই আছে প্রত্যেক বস্তুর ভাণ্ডার এবং আমরা তা পরিজ্ঞাত পরিমানেই নাযিল করে থাকি।

এখানে এ সত্যটি সম্পর্কে সজাগ করে দেয়া হয়েছে যে, সবকিছুর খযীনা তো তাঁর কাছেই। خزينة বলা হয় এমন স্থানকে যেখানে মূল্যবান সামগ্রী হেফাযত করা হয়। খযীনা বলে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, যত কিছু হওয়া সম্ভব সবই তার কাছে। তিনিই সেগুলোকে পরিমানমত অস্তিত্বহীন অবস্থা থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, এখানে বৃষ্টি বোঝানো হয়েছে। কারণ, বৃষ্টির কারণে সেগুলো উৎপন্ন হয়। [ফাতহুল কাদীর] সুতরাং বায়ু, পানি, আলো, শীত, গ্রীষ্ম, জীব, জড়, উদ্ভিদ তথা প্রত্যেকটি জিনিস, প্রত্যেকটি প্রজাতি, প্রত্যেকটি শ্রেণী ও প্রত্যেকটি শক্তির জন্য একটি সীমা নির্ধারিত রয়েছে। কোন কিছুই তাঁর নির্ধারিত সীমার বাইরে কেউ পেতে পারে না।

আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, "আর যদি আল্লাহ তাঁর বান্দাদের রিযিক প্রশস্ত করে দিতেন তবে তারা যমীনে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি তার ইচ্ছেমত পরিমাণেই নাযিল করে থাকেন। নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত ও সর্বদ্রষ্টা।" [সূরা আশ-শূরা: ২৭]

وَ اَرۡسَلۡنَا الرِّیٰحَ لَوَاقِحَ فَاَنۡزَلۡنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَسۡقَیۡنٰکُمُوۡهُ ۚ وَ مَاۤ اَنۡتُمۡ لَهٗ بِخٰزِنِیۡنَ ۱۵ : ۲۲

২২. আর আমরা বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু পাঠাই, তারপর আকাশ হতে পানি নাযিল করে তা তোমাদেরকে পান করতে দেই; অথচ তোমরা নিজেরা তা ভাণ্ডারে জমাকারী নও।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর কুদরত কিভাবে সমুদ্রের পানিকে ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র পৌছানোর অভিনব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছে। ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তিনি বাতাস পাঠান, সেগুলো আকাশ থেকে পানি বয়ে নিয়ে যায়। তারপর মেঘের উপর দিয়ে যাওয়ার পরে সেটা এমনভাবে পড়ার মত হয় যেমন দোহানোর আগে জন্তুর দুধ পড়ার অবস্থা হয়। দাহহাক বলেন, আল্লাহ মেঘমালার উপর বায়ু পাঠান তখন সেটা এমনভাবে সেটাকে পরাগায়ণের মত করে যে, তা পানিতে পূর্ণ হয়ে যায়। [ইবন কাসীর] এর ব্যাখ্যা এভাবে করা যেতে পারে যে, তিনি সমুদ্রে বাষ্প সৃষ্টি করেন। বাষ্পে বৃষ্টির উপকরণ বায়ু সৃষ্টি হয় এবং তা উপরে বায়ু প্রবাহিত করে একে পাহাড়সম মেঘমালার পানিভর্তি জাহাজে পরিণত করে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা এসব পানি পৃথিবীর সর্বত্র যেখানে দরকার পৌছে দিয়ে থাকেন।

এরপর আল্লাহর পক্ষ থেকে সেখানে যতটুকু পানি দেয়ার আদেশ হয়েছে আল্লাহর ফিরিশতারা এই উড়ন্ত মেঘমালা থেকে সেখানে সে পরিমাণ পানি বর্ষণ করছে।

আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেনঃ "তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। তাতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা থেকে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক। তিনি তোমাদের জন্য তা দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর গাছ, দ্রাক্ষা এবং সব রকমের ফল। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। [সূরা আন-নাহলঃ ১০-১১

"তিনিই স্বীয় অনুগ্রহের প্রাক্কালে সুসংবাদবাহীরূপে বায়ু প্রেরণ করেন এবং আমি আকাশ হতে বিশুদ্ধ পানি বর্ষণ করি– যা দ্বারা আমি মৃত ভূ-খণ্ডকে সঞ্জীবিত করি এবং আমার সৃষ্টির মধ্যে বহু জীবজন্তু ও মানুষকে তা পান করাই।" [সূরা আল-ফুরকানঃ ৪৮-৪৯]

আয়াতের দুটি অর্থ করা হয়ে থাকেঃ

একঃ তোমরা এ পানির কোন ভান্ডারের মালিক নও যে তোমরা চাইলেই তা পাবে। এটা তো শুধু আমার পক্ষ থেকে দান করা। [ফাতহুল কাদীর] এ আয়াতে আল্লাহর কুদরতের ঐ ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যার সাহায্যে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষ, জীব-জন্তু, পশু-পক্ষী ও হিংস্র জানোয়ারদের জন্য প্রয়োজনানুযায়ী পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে। এর ফলে প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বত্র, সর্বাবস্থায় প্রয়োজন অনুযায়ী পান, গোসল ও ধৌতকরণ এবং খেত-খামার ও উদ্যান সেচের জন্য বিনামূল্যে পানি পেয়ে যায়। কুপ খনন ও পাইপ সংযোজনে কারো কিছু ব্যয় হলে তা সুবিধা অর্জনের মূল্য বৈ নয়। এক ফোঁটা পানির মূল্য পরিশোধ করার ক্ষমতা কারো নেই এবং কারো কাছে তা দাবীও করা হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ "তোমরা যে পানি পান কর তা সম্পর্কে কি তোমরা চিন্তা করেছ? তোমরা কি ওটা মেঘ হতে নামিয়ে আন, না আমি ওটা বর্ষণ করি?" [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ ৬৮-৬৯]

দুই. দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যে পানি নাযিল করান তা নাযিল করার পর তোমরা ইচ্ছে করলেই তা সংরক্ষন করে রাখতে পার না। [ফাতহুল কাদীর] যতক্ষন আল্লাহ তা'আলা সে ব্যবস্থা করে না দিবেন। কারণ তা নাযিল হওয়ার পর নষ্ট করে দেয়া, ব্যবহার উপযোগী না থাকা অসম্ভব কিছু নয়। আল্লাহ বলেন, "আমি ইচ্ছে করলে ওটা লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও কেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর না? [সূরা আল-ওয়াকি'আহঃ ৭০] আরো বলেনঃ "এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; তারপর আমি তা মাটিতে সংরক্ষিত করি; আমি তাকে অপসারিত করতেও সক্ষম।" [সূরা আল-মুমিনুনঃ ১৮] আরো বলেনঃ "অথবা তার পানি ভূগর্ভে হারিয়ে যাবে এবং তুমি কখনো সেটার সন্ধান লাভে সক্ষম হবে না।" [সূরা আল-কাহফঃ ৪১] আরো বলেনঃ "বলুন, তোমরা ভেবে দেখেছ কি যদি পানি ভূগর্ভে তোমাদের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন কে তোমাদেরকে এনে দেবে প্রবাহমান পানি?" [সূরা আল-মুলকঃ ৩০]

وَ اِنَّا لَنَحْنُ نُحْيٖ وَ نُمِيْتُ وَ نَحْنُ الْوٰرِثُوْنَ ১৫ : ২৩

২৩. আর আমরাই জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই এবং আমরাই চুড়ান্ত মালিকানার অধিকারী।

তোমাদের ধ্বংসের পরে একমাত্র আমিই টিকে থাকবো। তোমরা যা কিছু পেয়েছো, ওগুলো নিছক সাময়িকভাবে ব্যবহার করার জন্য পেয়েছো। শেষ পর্যন্ত আমার দেয়া সব জিনিস ত্যাগ করে তোমরা এখান থেকে বিদায় নেবে একেবারে খালি হাতে এবং এসব জিনিস যেমনটি ছিল ঠিক তেমনটি আমার ভাণ্ডারে থেকে যাবে।

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

নিশ্চয় যমীন ও তার উপর যারা আছে তাদের চূড়ান্ত মালিকানা আমাদেরই রইবে এবং আমাদেরই কাছে তারা প্রত্যাবর্তিত হবে।সূরা মরিয়মঃ ৪০

আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যমীন ও এতে যা আছে সবকিছুরই চূড়ান্ত ওয়ারিশ তিনিই হবেন। এর অর্থ, যমীনের জীবিত সবাইকে তিনি মৃত্যু দিবেন। তারপরই সমস্ত কিছুর মালিক তিনিই হবেন, যেমনটি তিনি পূর্বে মালিক ছিলেন। কারণ তিনিই কেবল অবশিষ্ট থাকবেন। [ইবন কাসীর] কিয়ামতের দিন আবার সবাই তাঁর নিকটই ফিরে আসতে হবে।

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেছেনঃ "ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবকিছুই নশ্বর, অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময়, মহানুভব।" [সূরা আর রহমান: ২৬-২৭]

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِي

আমরাই জীবন দান করি এবং আমরাই মৃত্যু ঘটাই, আর সকলের ফিরে আসা আমাদেরই দিকে। সূরা কাফঃ ৪৩

وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَاْخِرِيْنَ ১৫ : ২৪

২৪. আর অবশ্যই আমরা তোমাদের মধ্য থেকে যারা অগ্রগামী হয়েছে তাদেরকে জানি এবং অবশ্যই জানি তাদেরকে যারা পশ্চাতে গমনকারী।

এখানে সাহাবী ও তাবেয়ী তাফসীরবিদদের পক্ষ থেকে الْمُسْتَقْدِمِينَ (অগ্রগামী দল) এবং الْمُسْتَأْخِرِينَ (পশ্চাদগামী দল) এর তাফসীর সম্পর্কে বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত রয়েছে।

১) কাতাদাহ ও ইকরিমা বলেনঃ যারা পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে তারা অগ্রগামী। আর যারা এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেনি, তারা পশ্চাদগামী।

২) ইবনে আব্বাস ও দাহহাক বলেনঃ যারা মরে গেছে, তারা অগ্রগামী এবং যারা জীবিত আছে, তারা পশ্চাদগামী [ফাতহুল কাদীর]

৩) মুজাহিদ বলেনঃ পূর্ববর্তী উম্মতের লোকেরা অগ্রগামী এবং উম্মতে মুহাম্মদী পশ্চাদগামী। [ফাতহুল কাদীর]

৪) কোন কোন মুফাসসির বলেনঃ ইবাদতকারী ও সংকর্মশীলরা অগ্রগামী আর গোনাহগাররা পশ্চাদগামী। [তাবারী; বাগভী]

৫) সাঈদ ইবনে মুসাইয়িব, কুরতুবী, শা'বী প্রমুখ তাফসীরবিদের মতে যারা সালাতের কাতারে অথবা জিহাদের সারিতে এবং অন্যান্য সৎকাজে এগিয়ে থাকে তারা অগ্রগামী এবং যারা এসব কাজে পেছনে থাকে এবং দেরী করে, তারা পশ্চাদগামী। [ইবন কাসীর; বাগভী]

বলাবাহুল্য, এসব উক্তির মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধ নেই। সবগুলোর সমন্বয় সাধন করা সম্ভবপর। কেননা, আল্লাহ তা'আলার সর্বব্যাপী জ্ঞান উল্লেখিত সর্বপ্রকার অগ্রগামী ও পশ্চাদগামীতে পরিব্যপ্ত।

"...তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সাথে আছেন। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। সূরা আল-হাদীদঃ ৪

"তুমি যে কোনো অবস্থাতেই থাকো এবং কুরআন থেকে যা-ই তিলাওয়াত করো আর তোমরা যে কোনো কাজই করো না কেন, তোমরা যখন তাতে প্রবৃত্ত হও, তখন আমরা তোমাদের প্রত্যক্ষদর্শী থাকি। আকাশ ও পৃথিবীর অণু পরিমাণ কোনো জিনিসই তোমার প্রতিপালকের অজ্ঞাত নয়..." সূরা ইউনুস ৬১

وَ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحۡشُرُهُمۡ ؕ اِنَّهٗ حَكِيۡمٌ عَلِيۡمٌ ২৫ : ১৫

২৫. আর নিশ্চয় আপনার রব তাদেরকে সমবেত করবেন; নিশ্চয় তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।

তার অপার কর্মকুশলতা ও প্রজ্ঞার বলেই তিনি সবাইকে একত্র করবেন। আবার তাঁর জ্ঞানের পরিধি এত ব্যাপক ও বিস্তৃত যে তার নাগালের বাইরে কেউ নেই। বরং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কোন মানুষের মাটি হয়ে যাওয়া দেহের একটি কণাও তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যেতে পারে না। তাই যে ব্যক্তি পরকালীন জীবনকে দূরবর্তী বা অবাস্তব মনে করে সে মূলত আল্লাহর প্রজ্ঞা ও কুশলতা সম্পর্কেই বেখবর। আর যে ব্যক্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে "মরার পরে যখন আমাদের মৃত্তিকার বিভিন্ন অণু-কণিকা বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে তখন আমাদের কিভাবে পুনর্বার জীবিত করা হবে," সে আসলে আল্লাহর জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ।

পুনরুত্থান ও বিচার দিবস: এই আয়াতে মহান আল্লাহ দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করেছেন যে, সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত মানুষকে তিনি কিয়ামতের দিন একত্রিত বা সমবেত করবেন। মানুষের কৃতকর্মের হিসাব নেওয়ার জন্য এটি অনিবার্য।

আল্লাহর প্রজ্ঞা (حَكِيمٌ): তিনি পরম প্রজ্ঞাময়। মানুষকে পুনরায় জীবিত করা এবং তাদের ভালো-মন্দের বিচার করার পেছনে তাঁর গভীর হিকমত বা প্রজ্ঞা রয়েছে। মহাবিশ্বের কোনো কিছুই তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি।

আল্লাহর জ্ঞান (عَلِيمٌ): তিনি সর্বজ্ঞ। সৃষ্টির প্রতিটি ধূলিকণা কার কোথায় মিশে গেছে, কে কী আমল করেছে—সবই তাঁর নখদর্পণে। কোনো কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তাই সবাইকে নিখুঁতভাবে সমবেত করা তাঁর জন্য অত্যন্ত সহজ।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

আমিই জীবন দান করি, আমিই মৃত্যু ঘটাই এবং আমারই দিকে সকলের প্রত্যাবর্তন। যেদিন মহাবিশ্ব বিদীর্ণ হয়ে তারা দ্রুত বের হয়ে আসবে। এই সমবেত করা আমার জন্য অত্যন্ত সহজ।" সূরা ক্বাফ (আয়াত ৪৩-৪৪):"

হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মানুষকে এমন এক শ্বেত-শুভ্র জমিনে সমবেত করা হবে, যা দেখতে নিখাদ ময়দার রুটির মতো সাদা হবে। সেখানে কারও চেনা-জানার কোনো চিহ্ন বা সীমানা থাকবে না।" (সহীহ বুখারী)

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মানুষকে নগ্নপদ, উলঙ্গ এবং খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।" আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষ ও নারী সবাই কি একে অপরের দিকে তাকাতে থাকবে? তিনি বললেন: "হে আয়েশা! সেদিনের পরিস্থিতি এত ভয়াবহ হবে যে, কেউ কারও দিকে তাকানোর অবকাশ পাবে না।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

জীবনকে অর্থপূর্ণ করার জন্য মৃত্যুর আগমন আল্লাহর এক মহান প্রজ্ঞা।মৃত্যু না থাকলে পৃথিবীতে মানুষের জায়গা হতো না এবং অপরাধীরা তাদের পাপের চূড়ান্ত সাজা থেকে বেঁচে যেত।মৃত্যুর পর আখেরাতে হাশরের মাঠে সমবেত করার বিধান রাখা হয়েছে, যাতে সৎকর্মশীলরা তাদের পুরস্কার পায় এবং অন্যায়কারীরা শাস্তি পায়। এটি আল্লাহর পরম ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ।

আধুনিক ইনফরমেশন থিওরি (Information Theory) অনুযায়ী, মহাবিশ্বের মৌলিক তথ্য বা ইনফরমেশন কখনো পুরোপুরি মুছে যায় না। মানুষের প্রতিটি কোষের ডিএনএ (DNA)-তে তার শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের সমস্ত ব্লুপ্রিন্ট বা কোড সংরক্ষিত থাকে। বিজ্ঞান যেভাবে ক্লোনিং বা জিনগত প্রযুক্তির মাধ্যমে একটি কোষ থেকে হুবহু জীব তৈরি করতে পারে, সেই যুক্তি অনুসরণ করলে বলা যায়, পরম দয়াময় শক্তিশালী মহান রবের পক্ষে মানুষের সংরক্ষিত তথ্যভাণ্ডার (Information Database) থেকে তাকে হুবহু পুনর্নির্মাণ করা সম্পূর্ণরূপে যৌক্তিক।

পুনরুত্থান বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেন, ‘মানুষ আমার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায় এবং বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে; যখন তা পচে-গলে যাবে? বলো (হে রাসুল), তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সুরা ইয়াসিন : ৭৮-৭৯)

যেভাবে পুনরুত্থান :

কিয়ামতের প্রথম ফুৎকারের পর পুরো পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। এরপর দ্বিতীয় ফুৎকারের আগে আল্লাহ তাআলা আকাশ থেকে এক বিশেষ বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা মানুষের ক্ষুদ্র হাড় (টেইলবোন) সেই পানি শোষণ করবে এবং বৃষ্টির পানিতে যেভাবে শাক-সবজি বা ঘাস গজিয়ে ওঠে, ঠিক সেভাবে প্রত্যেক মানুষের পূর্ণাঙ্গ শরীর এই হাড়টিকে কেন্দ্র করে আবার মাটির নিচ থেকে নিখুঁতভাবে তৈরি হয়ে উঠবে। ইসরাফিল (আ.) যখন দ্বিতীয়বার শিঙায় ফুঁ দেবেন, তখন মহাবিশ্বের পূর্বের সব মৃত জীব ও মানুষ একযোগে জীবিত হয়ে উঠবে। মানুষ তাদের কবর বা যেখানেই তাদের অবশিষ্টাংশ থাকুক না কেন, সেখান থেকে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে দ্রুত বের হয়ে আসবে।

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দুইবার ফুৎকারের মাঝে ৪০ হবে।' সাহাবিরা বললেন, হে আবু হুরায়রা! ৪০ দিন? তিনি বললেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারা বললেন, এ কি ৪০ মাস? তিনি বললেন, আমি অস্বীকার করলাম। তারা বললেন, এ কি ৪০ বছর? তিনি বললেন, অস্বীকার করলাম (অর্থাৎ আমারও জানা নেই)। অতঃপর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হবে, এতে তারা উদগত হবে যেমন সবজি উদগত হয়। অতঃপর তিনি বললেন, তখন একটি হাড় ব্যতীত মানুষের গোটা শরীর পচে যাবে। আর সে হাড়টি হলো মেরুদণ্ডের (সর্বনিম্ন ভাগের এবং নিতম্বের ওপরের) হাড়। কিয়ামতের দিন এ হাড় থেকেই আবার মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে। (মুসলিম, হাদিস : ৭১৪৬)

আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এসবের সত্যতা দেখা যায়। মায়ের গর্ভে মানবশিশু সৃষ্টির প্রাথমিক ধাপে (গর্ভধারণের প্রায় ১৪-১৫তম দিনে) ভ্রূণে একটি রেখা বা বিন্দুর আবির্ভাব ঘটে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় Primitive Streak। এর থেকেই মানবদেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্নায়ুতন্ত্র, মাংসপেশি ও হাড় তৈরি হওয়া শুরু হয়। শিশুর পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণের পর এই আদি রেখাটি সংকুচিত হয়ে মেরুদণ্ডের একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে অবস্থান নেয়, যাকে Coccyx বা টেইলবোন বলা হয়। হাদিসে এই বিশেষ হাড়টিকে 'আজবুয-জানাব' বলা হয়েছে।

গবেষকরা এই আদিরেখা বা টেইলবোনের কোষ নিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছেন। এটি চরম অবস্থায়ও টিকে থাকে। তারা এই কোষগুলোকে তীব্র এসিডে ফুটিয়েছেন, শক্তিশালী তেজস্ক্রিয়া দিয়েছেন এবং অত্যন্ত উচ্চ তাপমাত্রায় পুড়িয়েছেন। দেখা গেছে, প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞের পরও এই কোষগুলোর মূল গঠন বা ডিএনএ পুরোপুরি ধ্বংস হয় না। মাটির নিচে হাজার বছর থাকলেও ব্যাকটেরিয়া বা রাসায়নিক বিক্রিয়া এই অংশটিকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করতে পারে না। আধুনিক জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering) ও স্টেম সেল থেরাপির যুগে বিজ্ঞানীরা জানেন যে কোনো প্রাণীর একটিমাত্র জীবন্ত কোষ বা ডিএনএ-এর সঠিক তথ্য-উপাত্ত (Blue-print) থাকলে তা থেকে হুবহু সেই প্রাণীকে আবার ক্লোন বা তৈরি করা সম্ভব। এই টেইলবোনটি হলো মানুষের দেহের সেই সুরক্ষিত 'ডিএনএ চিপ' বা ব্লু-প্রিন্ট, যা মাটির নিচে সুরক্ষিত থাকে। কিয়ামতের দিন আল্লাহর আদেশে বিশেষ বৃষ্টির পানি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে এই ক্ষুদ্র হাড়ের কোষগুলো সক্রিয় হয়ে উঠবে এবং পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ পুনর্গঠিত হবে।

মানবজীবনে আল্লাহর হিকমা বা প্রজ্ঞা বোঝার মূল চাবিকাঠি হলো 'তাওয়াক্কুল' বা আল্লাহর ওপর ভরসা করা। একজন বিশ্বাসী যখন বোঝেন যে তার জীবনের প্রতিটি ঘটনাই এক পরম প্রজ্ঞাময়ের সুনির্ধারিত পরিকল্পনার অংশ, তখন তার মন থেকে হতাশা দূর হয়ে যায় এবং সে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে।